নাথবতী অনাথবৎ ও *নিত্যপুরাণ*: মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের বিনির্মাণ

ফারজানা আফরীন রূপা*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বের ইতিহাস সাহিত্য সৃষ্টির সমবয়সী। একটি টেক্সটকে পুনঃ পুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণ দ্বারা শিল্পের প্রকৃত রসানুসন্ধান ও নতুন ব্যাখ্যায় তাকে তুলে ধরা বিনির্মাণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য। দ্রৌপদী মহাভারতের এমন এক চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে মহাকাব্যটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আবর্তিত। নাট্যকার শাঁওলী মিত্র ও মাসুম রেজা *নাথবতী অনাথবৎ* (বাংলা ১৩৯৮ সাল) ও *নিত্যপুরাণ* (২০০৪) নাটকে *মহাভারতে*র ঘটনাবলিকে অনুসরণ করলেও দ্রৌপদী চরিত্র অঙ্কনে তাড়িত হয়েছেন নিজস্ব বোধশক্তি দ্বারা। শাঁওলী মিত্র দ্রৌপদী চরিত্রের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন জন্ম অলৌকিকতা ও স্বয়ম্বর-সভায় রাজনৈতিক চালের সম্মুখীন করে। পঞ্চস্বামী গ্রহণে বাধ্য হওয়া দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার পরাজয়ে অসম্মানিতা হয়ে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা বুকে জ্বালিয়ে জীবন ধারণ করে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হয় পরজনমে ভালবাসা পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। *নিত্যপুরাণ* নাটকে নাট্যকার *মহাভারতে*র একলব্য অধ্যায়ে অনুপস্থিত দ্রৌপদীকে তাঁর লেখনীর আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন। পাঁচজনকে স্বামী হিসেবে বরণে বাধ্য হওয়া দ্রৌপদী সমাজের উদ্দেশ্যে নিজেকে বারবনিতাতুল্য বলে জানায়। ভালবাসার জন্য আজন্ম তৃষ্ণার্ত এই চরিত্র নাটকের শেষ পর্যায়ে নিজেকে সমাজের বিধি-নিষেধে আবদ্ধ এক নারীরূপে আবিষ্কার করে। আলোচ্য দুই নাট্যকার তাঁদের নাটকে কখনো *মহাভারতে*র ঘটনাবলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, কখনোবা *মহাভারত*-বহির্ভূত কাল্পনিক ঘটনা দাঁড় করিয়ে দ্রৌপদী চরিত্রকে এঁকেছেন। *নাথবতী অনাথবৎ* ও *নিত্যপুরাণ* দুই নাটকেই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে দ্রৌপদী নামের এক শৃঙ্খলিত নারীর চিৎকার, যা আদর্শ-দেবী-বিদ্রোহী-অদম্য প্রভৃতি আংশিক-সত্যমিশ্রিত কৃত্রিম বিশেষণে *মহাভারত*সহ বহু গবেষণায় ও সাহিত্যে চাপা পড়া। আদর্শের অবগুণ্ঠন তুলে অকৃত্রিমতায় সেই দ্রৌপদী চরিত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধ-রচয়িতা গবেষণায় অগ্রসর হয়েছেন। সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে উক্ত দুই নাটকে নাট্যকারগণ দ্রৌপদী চরিত্রের যে অনালোকিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তারই নব ব্যাখ্যাপূর্বক সাধারণ মানবীরূপে দ্রোহ-আশা-নিরাশা-প্রেম-কল্পময়তায় তাঁকে অসামান্যতায় নয় বরং সামান্যতায় অন্বেষণ প্রাবন্ধিকের মূল লক্ষ্য।

চাবিশব্দ: প্রেম, অসম্মান, বিদ্রোহ, শৃঙ্খলতা, অসামান্যতা।

---

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
ই-মেইল: rupa18@ymail.com

Abstract: The history of deconstruction theory in literature is coeval with the creation of literature. The objectives of deconstruction theory are to re-read and analyse a text, bringing out new interpretations, renditions and the true aesthetics of the art at hand. Several significant events, across cultures and borders were centered on Draupadee, one of the most important characters of Mahabharata. Although Shaoli Mitra and Masum Reza, the two contemporary playwrights, took the plot of Mahabharata, they wrote by their personal intuition Nathavati Anathavat (Bangla 1398) and Nityapurana (2004) in which they re-created, reshaped and represented the character of Draupadee. Shaoli Mitra developed the Draupadee's character through the use of miraculous births and political manoeuvres regarding the royal-courts. In the play, Draupadee being forced to accept "Panchaswamy", bears the vengeance in her heart as she must live on after being dishonoured by Yudhisthira. It is seen at the end of her life that even the dream of finding love in the afterlife is lost. In Nityapurana, the playwright tries to accentuate Draupadee in one of the chapters by giving her a life through his creativity. Draupadee is introduced to the society as a prostitute as she is forced to accept five husbands. At the end of the play, Draupadee finds herself constrained by the intricacies and conventions of the society, while she is disquieted and desperate for love. The two playwrights have created Draupadee in their works by questioning the events of the Mahabharata and including fictional occurrences that call into doubt the epic's narrative. The two texts depict that the cries of a Dalit woman, Draupadee, have been buried in superficial attributes such as honest, goddess, rebellious, faithful etc. found in many research and literary works including Mahabharata. This paper aims to explore the true essence of the historical character, Draupadee while looking into further the authenticity of such re-creation and distortion of the epic's plot. In the light of the theory of deconstruction, the study analyses the character as a human being having all human characteristics such as rage, hope, disillusion, emotion, imagination and so on.

১. ভূমিকা

মহাকাব্য *মহাভারত* বৈচিত্র্যময় বহু ঘটনা ও চরিত্রকে ধারণ করেছে। যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকরা *মহাভারতে*র ঘটনা ও চরিত্রকে অনুভব করেছেন আপন বোধশক্তি দ্বারা। কখনো সাহিত্যিক চিন্তা পুরাণ-অনুগামী হয়েছে, আবার কখনো পুরাণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রকে এক গভীর অনুসন্ধিৎসার চোখে দেখেছেন তাঁরা। সাহিত্যে একে বিনির্মাণ তত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। পুনঃ পুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণপূর্বক, শিল্পের প্রকৃত গূঢ় রহস্য-উন্মোচন ও নতুন ব্যাখ্যায় তার উপস্থাপন বিনির্মাণ তত্ত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

*মহাভারতে*র মহানায়িকা হিসেবে আখ্যায়িত দ্রৌপদী এমন এক চরিত্র, যে চরিত্র কালে কালে মহাকাব্যের বিচিত্র ঘটনাবলি, লেখকের বোধ এবং কল্পশক্তির মিশেলে বর্ণিল হয়ে উঠেছে, বিনির্মিত হয়েছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ শাঁওলী মিত্রের *নাথবতী অনাথবৎ* ও মাসুম রেজার *নিত্যপুরাণ*। কথকতার ভঙ্গিতে নাট্যকার শাঁওলী মিত্র *মহাভারতে*র দ্রৌপদীকেন্দ্রিক কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই চরিত্রের প্রায় পূর্ণ জীবনাবয়বই তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, *নিত্যপুরাণ* নাটকের মূল উপজীব্য *মহাভারতে*র একলব্য আখ্যান। মহাকাব্যে অনুল্লেখিত হলেও নাট্যকার একলব্য-দ্রৌপদীকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখোমুখি করেছেন। অতীত-বর্তমানের কিছু ঘটনা, কয়েকটি প্রশ্ন এবং তার জটিল উত্তরের উপর ভিত্তি করে মানবী দ্রৌপদী চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিক নতুনভাবে উন্মোচিত করেছেন নাট্যকার এই নাটকে। কিন্তু এই দুই নাট্যকারের নাট্যচিন্তার সাদৃশ্য এখানেই যে, তাঁরা দ্রৌপদীকে অসামান্যতায় অনুসন্ধান করেননি। বরং অসামান্যতার অবগুণ্ঠনে সমাজের এই চরিত্রের উপর চাপিয়ে দেয়া নানা অবিচারের চিত্র তাঁরা আঁকতে তৎপর হয়েছেন। *মহাভারতে*র দ্রৌপদীকে সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব আর তার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সন্ধান করেছেন নাট্যকারগণ।

২. লিটারেচার রিভিয়্যু

আলোচ্য প্রবন্ধে *নাথবতী অনাথবৎ* এবং *নিত্যপুরাণ* নাটকে মহাভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নারী-চরিত্র দ্রৌপদীকে নিয়ে নাট্যকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও নাট্য-পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে তথ্য ও বর্ণনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাট্যকারগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত অনুগামী হননি। জৈনপুরাণ ও শ্রীমতি ইরাবতী কার্বের (১৯০৫-১৯৭০) বিশ্লেষণকে যেমন নাট্যঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, তেমনি নিজস্ব কল্পনায় প্রাসঙ্গিক ঘটনা সৃজন ও তার শক্তিশালী ব্যাখ্যা প্রদানেও কুণ্ঠিত হননি। ফলাফলস্বরূপ যে দ্রৌপদী নাটকের মাধ্যমে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, নারী শ্রেষ্ঠা বলে দৈবিক বাণীতে প্রচারিত হয়েও যাপিত জীবনে সেই নারী সাধারণ নারীই। ভূমিস্পর্শী এই নারীর উপর অসামান্যতার নামে নানা অনাচার- অত্যাচার সরিয়ে স্বাভাবিকতা ও সামান্যতায় সেই নারীর প্রকৃত রূপ সন্ধান আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। মহাভারতের ঘটনাবলি, রাজনীতি, চরিত্রসহ বিচিত্র বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলি দ্রৌপদী চরিত্রের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্বেষণে প্রাবন্ধিককে সম্মুখপথে অগ্রসর করেছে। আবার অসামান্যতার অবগুণ্ঠন চাপিয়ে দ্রৌপদী চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে রুদ্ধ করার বৈধতা দেয়া গবেষকদের লেখা প্রাবন্ধিককে দ্বিধাবিভক্তও করেছে নানা পর্যায়ে। বহুমুখী ঘটনা, তথ্য-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নাটকে অসামান্য এই দ্রৌপদী চরিত্রের ব্যক্তি-চিত্রণকে সামান্যতায় অনুসন্ধান গবেষকের মূল লক্ষ্য।

৩. গবেষণা কাঠামো

উক্ত প্রবন্ধে *নাথবতী অনাথবৎ* ও *নিত্যপুরাণ* নাটকের পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণপূর্বক নাট্যচিন্তায়, বৃত্ত ও চরিত্রের বিস্তারে নাট্যকারগণ দ্রৌপদী চরিত্রকে যে সব বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেছেন তাকেই মূল ধরে, নব অর্থে তার বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের লক্ষ্যেই প্রাবন্ধিক গবেষণায় ব্রতী হয়েছে। পাঠ/আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Content Analysis Method) অনুসরণে উক্ত দুই নাটকের মূল পাঠের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্যের বা দ্রৌপদী চরিত্রের নব-

পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূল টেক্সট বা পাঠ বিশ্লেষণপূর্বক বর্ণনার আশ্রয়ে গবেষক নিজস্ব পর্যবেক্ষণকেও সামনে এনেছেন। বর্ণনামূলক পদ্ধতির (Descriptive Method) অনুসরণও তাই উক্ত প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হবে।

৪. তাত্ত্বিক কাঠামো

বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কবীর চৌধুরী বলেছেন: "এ প্রক্রিয়ায় একটি টেক্সটকে সযত্নে পড়ে, বাইরের সব প্রভাব বর্জন করে, শুধু ওই টেক্সটের ভেতর থেকেই তার সবটুকু ছেঁকে তোলার চেষ্টা করা হয়।" (চৌধুরী, ২০০৮, পৃ. ৪৯) প্রবন্ধে দ্রৌপদীকে জন্ম-অলৌকিকতা, দিব্যরূপের অধিকারী, স্বয়ম্বর-সভার নামে রাজনৈতিক চালে বন্দি আর্য-অনার্য ভেদের বিপরীতে মানবিকতা, পঞ্চস্বামী লাভের গর্বকে বারবনিতা সমতুল্য জ্ঞান, ভালবাসাকাঙ্ক্ষী, অসম্মানিতা, ধর্মযুদ্ধ-প্রত্যাশী, পরজন্মে ভালবাসা-অভিলাষী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে নবতর অর্থে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৪.১ জন্ম অলৌকিকতা ও দিব্যরূপধারী নারী

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
যুগে যুগে হয় তার নতুন ব্যাখ্যান,
হয় নতুন ব্যাখ্যান!

> (হেসে) বড় মনে ধরলো! আর তাইতে মশায়েরা, মনে পড়ল এক রাণীর কথা! রাণী কিন্তু রাণী নয়। সম্রাজ্ঞী কিন্তু সম্রাজ্ঞী নয়। রাজ্যেশ্বরী হয়েও রাজ্যহারা, সব পেয়েও সব্বোহারা এক অভাগিনী মেয়ের কথা। (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৬)

নাথবতী অনাথবৎ নাটকের কথক ঠাকরুণ মাত্র কয়েকটি বাক্যে দ্রৌপদীর সমগ্র জীবনকে ব্যক্ত করে শুরু করেন নাটক। মাসুম রেজার *নিত্যপুরাণ* নাটকের প্রায় মধ্যভাগে দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটে এক জটিল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। পুরাণকে পাল্টে দেবার মানসে তৎপর একলব্য এই নাটকের মূল চরিত্র। অস্ত্রকুশলতায় শ্রেষ্ঠ এই নিষাদবীর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অর্জুন তথা পঞ্চপাণ্ডবকে পরাজিত করে। পরাভূত পঞ্চপাণ্ডব পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, তখন বিষাক্ত এক শর শ্যেন পাখি নিয়ে যাওয়ায় ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে। একলব্য ঘোষণা করে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একজনের জীবন রক্ষা হবে। পঞ্চপাণ্ডব এক প্রাণ, তাই মৃত্যুকে বরণ করতে চায় সবাই। আশ্চর্যজনক উপায়ে সেই এক পাণ্ডব নির্বাচনের পথ খুঁজে একলব্য, পঞ্চপাণ্ডব ভার্যা দ্রৌপদীর কাছে যার জীবন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান সেই বাঁচবে। একলব্যের নির্দেশে বাণ ছুঁড়ে দ্রৌপদীর কাছে বিপদ সংকেত পাঠায় অর্জুন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই নাটকে দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটে সর্জবনে। যোজনগন্ধার দৈবিক পরিচয়ে *নিত্যপুরাণ* নাটকে দ্রৌপদীর আবির্ভাব হলেও ঘটনা পরম্পরায় যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর দৈব নয় বরং মানবীরূপ প্রকাশ পায় নাটকে। অলৌকিকতায় ঘেরা দ্রৌপদীর জন্মকথা ও রূপবৃত্তান্ত *মহাভারতে* বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে :

> ...তারপর যজ্ঞবেদী থেকে কুমারী পাঞ্চালী উঠলেন, তিনি সুদর্শনা, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশী, পীনপয়োধরা, তাঁর নীলোৎপলতুল্য সৌরভ এক ক্রোশ দূরেও অনুভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল– সর্ব নারী শ্রেষ্ঠা এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষত্রিয়ক্ষয় এবং কুরুবংশের মহাভয় উপস্থিত হবে। (ব্যাস, ২০০৯, পৃ. ৭২)

যজ্ঞের অগ্নি থেকে দ্রৌপদীর আবির্ভূত হওয়ার লগ্নেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বাণীও উচ্চারিত হয়েছিল। অনুচ্চারিত ছিল না যে, এই নারীর কারণে ভবিষ্যতে বহু জীবন বিপন্ন হবে এবং কুরুবংশের ত্রাসের কারণও হবেন দ্রৌপদী। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে দ্রৌপদীর জন্ম-রহস্য, পিতৃপরিচয় ও রূপবর্ণনা নাটকের প্রথমার্ধের শুরুতেই নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন এরূপে :

> দ্রুপদনন্দিনী সে যে রাজার দুলালী
> যজ্ঞের অগ্নি থেকে আবির্ভূতা নারী। [...]
> সে কৃষ্ণা, কৃষ্ণবর্ণা! (খুব গর্ব করে বলে সে এই কৃষ্ণবর্ণের কথা)
> সে পদ্মগন্ধা!- এমন সেই সুগন্ধ সে নাকি যোজন যোজন দূর থেকেই পাওয়া যেত!
> সে ভ্রমর চক্ষু!
> সে দীর্ঘাঙ্গিনী!
> সে সুকেশিনী!- এমন সেই কেশ খুলে দিলে মনে হতো নদীর ঢল নামল।
> সে অপরূপা। (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৬-৭)

নাথবতী অনাথবৎ নাটকে যজ্ঞের আগুন থেকে উত্থিতা যাজ্ঞসেনীর স্বল্পকথায় জন্মপরিচয় দিয়েই নাট্যকার দ্রৌপদীর রূপবর্ণনার মাধ্যমে নাট্য-কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। *নিত্যপুরাণ* নাটকে দ্রৌপদীর জন্মকথা অনুচ্চারিত হলেও একলব্যের সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার দ্রৌপদীর দিব্যরূপের বর্ণনা দিয়েছেন :

> এই যে আপনার কুঞ্চিত কুন্তলদল, জগতে অন্ধকারের উৎস।... পাঞ্চালী, নীলোৎপল আঁখি আপনার, পাঁপড়ি মেলে ফুটে আছে যেন এই শুদ্ধ সরোবরে। ...পাঞ্চালী, পাঞ্চালী আপনার এই ঐশ্বর্যময় স্তনযুগল যেন ভাদরের ভরা নদী।... আর আপনার নরম নাভীমূলে যে স্পন্দন, ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয় কম্পন, তা প্রাণের মূর্ছনা, এ নিরাভরণ নাভিমূলে যদি কেউ চুম্বন দেয় একবার, সমগ্র বিশ্বভূমে সে চুমু খায় একবারে। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪৩-৪৪)

মহাভারতের দ্রৌপদীর রূপ অগ্নিতুল্য। পতঙ্গ যেমন আগুনের রূপমুগ্ধ হয়ে ছুটে যায় তার পানে, *মহাভারতের* বহু পুরুষও দ্রৌপদীর রূপে আকর্ষিত হয়েছেন। ফলাফল পতঙ্গের মতই দগ্ধতা প্রাপ্তি। বিপরীতে অপরূপা দ্রৌপদী ক্ষাত্রনারী, পুরুষের কান্তি তার চোখ ভুলালেও মন টেনেছে বীরত্ব।

৪.২ স্বয়ম্বর-সভা নামের রাজনৈতিক চাল ও আর্য-অনার্য ভেদের বিপরীতে মানবিকতা

মহাভারতের মতই *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে জন্ম অলৌকিকত্বের পর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর প্রথম সাক্ষাত মিলে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে দ্রৌপদীর বর হিসেবে পাওয়ার

গোপন বাসনায় দ্রুপদ-রাজা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। পরীক্ষা হিসেবে নির্ধারিত হয়– বিশালাকার ধনুর সাহায্যে মীনচক্ষুভেদ। অর্জুনকে দ্রৌপদীর বর হিসেবে চাওয়ার পিছনে শুধু যে অর্জুনের বীরত্বই একমাত্র কারণ ছিল তা নয়। বরং রাজা দ্রুপদের রাজনৈতিক চিন্তাও এক্ষেত্রে অনেক বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মিলে *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে। উল্লেখ্য কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষার গুরুদক্ষিণা হিসেবে তখন অর্ধপাঞ্চাল রাজ্য দ্রোণাচার্যের হস্তগত, এমনকি কৌরব রাজসভায় আচার্য শিক্ষাগুরু এবং পরম মিত্র বলে অধিষ্ঠিত। পিতামহ ভীষ্মের এমন আচরণে ভীত ও ক্ষুব্ধ দ্রুপদ, তাই শত্রুর শত্রু মিত্র– এই রাজনৈতিক বিপরীত চাল দিতে পাণ্ডবদের কাছে টানতে চেয়েছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভার অন্তরালে ভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও পাঞ্চালরাজার অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকন্যাকে লাভ করার জন্য রাজা-রাজন্যবর্গ থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ-সুত অসংখ্য মানুষ একত্রিত হয়েছিল। সভায় উপস্থিত দ্রৌপদী-আকাঙ্ক্ষী জন আর তাদের পরস্পরের পারিবারিক সম্পর্ক বিবেচনায় আনলে বর্তমানে দ্বিধান্বিত হওয়া স্বাভাবিক হলেও, প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। স্বয়ম্বর নাম্নী প্রবল নারী-স্বাধীনতার বিষয়টিতেও তাই লক্ষ্য ঠিক করেই বর নির্বাচনের উপায় নির্ধারণ করে সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি দ্রৌপদীর পিতা-ভ্রাতা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সূতপুত্র কর্ণের সেই বিশাল ধনুকে জ্যা রোপনের প্রসঙ্গটি *নাথবতী অনাথবৎ* এবং *নিত্যপুরাণ* উভয় নাটকেই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। শাঁওলী মিত্রের নাটকে কথক কথাচ্ছলেই বর্ণনা করে: "ধনুকটা কেউ তুলতেই পারলে না। ও, না-না- কর্ণ এসে তুলেছিল ধনু-টা। কিন্তু দ্রৌপদী তো তার গলায় মালা দিতে চাইলে না, কাজেই কর্ণর তীর ছোঁড়া হ'লো না। সে চলে গেল।" (শাঁওলী মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ১৬)। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে নাট্যকার দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নের সংলাপে উচ্চকুলসম্পন্ন শব্দটি ব্যবহার করে সূতপুত্র কর্ণের বীরত্ব প্রদর্শনের পথে বাধা সৃষ্টি আগেই করে রেখেছিলেন। তাই দ্রৌপদীর উপর কর্ণকে প্রত্যাখ্যানের দায় নাটকে বর্তায় না। কিন্তু *মহাভারতে* দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন লক্ষ্যভেদ যিনিই করবেন, কৃষ্ণা তাঁরই গলায় বরমাল্য দেবেন। প্রসঙ্গত বলা যায় তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় নারী এতটা স্বাধীন ছিল না যে, দ্রৌপদী সভামধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞা অগ্রাহ্য করে প্রত্যাখ্যান করবেন সূতপুত্র বীর কর্ণকে । স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেও তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাওয়া পাওয়া, বর্ণভেদ প্রথা এমনকি পিতা-ভ্রাতার রাজনৈতিক চালও প্রতিফলিত। অপরদিকে *নিত্যপুরাণ* নাটকে দ্রৌপদী-কর্ণ প্রসঙ্গে নাট্যকার *মহাভারত* নয় বরং বহু-পরবর্তী সময়ের জৈনপুরাণ অনুসারী। এই নাটকে দ্রৌপদীর কর্ণকে প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটিকে স্বল্প পরিসরে নাট্যকার তুলে ধরলেও এর গভীরতা *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকের মতই অতলস্পর্শী :

> ... কর্ণ, সুদর্শন যুবক। বীরের প্রকৃত গাম্ভীর্য যার চোখে-মুখে ছিল, সে গাম্ভীর্যে আপনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন... তখন সেই সভাতে ধ্বনি উঠল, সূতপুত্র, সূতপুত্র কর্ণ কেন দ্রৌপদীর

> স্বয়ম্বরায়? আর আপনি ত্বড়িত বলে উঠলেন তখন, আমি সূতজাতীয়কে বরণ করব না, আপনাকে শেখানো ছিল অবশ্য। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৩৪)

নিত্যপুরাণ নাটকে নাট্যকার স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুনের সমকক্ষ বীর কর্ণের কান্তি ও গাম্ভীর্যে মুগ্ধরূপে দ্রৌপদীকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন বর্ণপ্রথাকে হাতিয়ার করে সমাজ প্রশ্নের আঙ্গুল তুলল সূতপুত্র কর্ণের দিকে, দ্রৌপদী মুগ্ধতাকে অতিক্রম করেন প্রত্যাখ্যান দ্বারা। এই প্রত্যাখ্যানের পিছনে আছে দ্রৌপদীর পিতা-ভ্রাতার কর্ণের কাছে দ্রৌপদীকে সমর্পণে অনীহা। বিপরীতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সাথে পাঞ্চাল রাজ্যের বৈবাহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ। নাটকের দ্রৌপদী অবশ্য নিজের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলে তাঁর যোগ্য বর ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেউ হতে পারে না। একলব্য যখন এই বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলে কর্ণ প্রসঙ্গের পুনঃঅবতারণা করে, দ্রৌপদী নিজেকে আড়াল করে এরূপে : "কারও একান্ত বিষয়ে অনধিকার প্রবেশ মন্দকাজ তা জানবেন।" (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৩৪)। *মহাভারতে* নেই কিন্তু পরবর্তীকালে জৈনপুরাণে উল্লেখিত এই প্রসঙ্গ নাটকে তুলে ধরে নাট্যকার মানবী দ্রৌপদীর অন্তর্লোকে আলো ফেলতে সচেষ্ট হয়েছেন। অলৌকিকতা যার জন্মে, সেই দ্রৌপদী মানবিক আবেগে স্বয়ম্বর-সভার কর্ণকে ভুলতে পারে না। তেমনি বিস্মৃত হয় না স্বয়ম্বর-সভায় কেবল অর্জুন জয় করেছিল তাকে, তৃতীয় পাণ্ডবকেই নিজ অন্তর ও উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বরমাল্য পরিয়েছিল সে। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে কর্ণকে অর্জুনতুল্য বীর বলে অভিহিত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাটকে দ্রৌপদীর হৃদয়ে কর্ণের জন্য আলাদা কোন দুর্বলতা তৈরি হয় না। স্বয়ম্বর-সভায় প্রথম দর্শনেই অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর মুগ্ধতা নাট্যকার ব্যক্ত করেন এরূপে :

> ...এতক্ষণ বাদে এই কৃষ্ণবর্ণ যুবকটিকে দেখে তার মনে হলো– এক সত্যিকারের পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে সভা আলো ক'রে। যুবকটি ধনুকটি তুলল আর দ্রৌপদীর চোখ দুটি কেমন নিবিড় হ'য়ে উঠল। সে তাতে জ্যা রোপণ করল, আর দ্রৌপদী ভাবছে, 'পারবে তো? পারবে তো এই বীর লক্ষ্যভেদ করতে? পারবে তো?' (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ১৮)

দুই নাটকেই আর্য-অনার্যভেদে দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শাঁওলী মিত্র বর্ণভেদ অন্তরে ধারণ করা দ্রৌপদীকে উপস্থাপন করেছেন, মাসুম রেজার দ্রৌপদী এই ভেদাভেদ মেনে নিতে বাধ্য হওয়া নারী। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে পরবর্তীকালে কুরুসভায় বস্ত্রহরণ পর্বে কর্ণকে বিপরীতরূপে উপস্থাপিত হতে দেখা যায় *মহাভারত* অনুসরণে, কিন্তু *নিত্যপুরাণ* নাটকে ব্যতিক্রম ঘটে। স্বয়ম্বর-সভার সেই বীর কর্ণের বীরত্বের ছবি মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষা করেছেন দ্রৌপদী। পিতা-ভ্রাতার শেখানো অথচ নিজ মুখ থেকেই উচ্চারিত বর্ণভেদ মেনে নিতে বাধ্য হলেও, মন থেকে স্বীকার করেননি দ্রৌপদী। অনার্য পরিচয়ের কর্ণ-প্রসঙ্গ তাই পরিণতি না পাওয়া ভালবাসার ন্যায় সর্বসম্মুখে অস্বীকার্য কিন্তু দ্রৌপদীর হৃদয়ে সযত্নে রক্ষিত। আর্য-অনার্য ভেদ যে দ্রৌপদী জীবনে সমাজ ও লোকভয়ে মেনে নেয়ার প্রয়াস মাত্র তার প্রমাণ নিষাদ একলব্যের প্রতি তার ভালবাসা-মমত্ববোধ আর প্রতিজ্ঞা রক্ষার ঘটনায়ও মিলে।

৪.৩ পঞ্চপাণ্ডবকে পতিত্বে বরণের নামে বারবনিতা জীবন

নাথবতী অনাথবৎ নাটকে ব্রাহ্মণরূপী অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পর সলজ্জ দ্রৌপদী বরমাল্য পরায় বিজয়ী বীরকে এবং নারীধর্ম অনুসারে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সাথে সভা ত্যাগ করে। স্বয়ম্বর-সভায় ভীমও উপস্থিত ছিলেন, পথমধ্যে ভীমার্জুনসহ দ্রৌপদীর সঙ্গী হয় বাকি তিন ভাই। জননী কুন্তী পুত্ররা ভিক্ষা এনেছে জেনে দ্রৌপদীকে না দেখেই বলেন : "যা এনেছো, পাঁচজনে মিলে ভোগ কর বাবা!" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ২৪)। যুধিষ্ঠির নিজসহ বাকি ভাইদের মনের অবস্থা আঁচ করেন, পাঁচ ভাই এর প্রত্যেকেই তখন দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত। তিনি মনে করেন, দ্রৌপদী যদি বিশেষ এক পাণ্ডবের স্ত্রী হয়– পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে বিভক্তি আসবে। এছাড়াও যুধিষ্ঠির মিলিয়ে নেন ঋষির ভবিষ্যৎবাণী (পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হবে দ্রৌপদী), অপরদিকে মাতৃআজ্ঞা তো ছিলই, সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত হয়– পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হবেন দ্রৌপদী। এই সিদ্ধান্তে তেজস্বিনী দ্রৌপদীর মনের অবস্থা কী হয়েছিল তার বিশেষ উল্লেখ *মহাভারতে* নেই, কিন্তু আলোচ্য দুই নাটকেই এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন নাট্যকারগণ। শাঁওলী মিত্রের *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে কথক ঠাকরুণ তো সরাসরিই দর্শকের দিকে তাকিয়ে বলে :

> কথক : (একগাল হেসে হাতে প্রায় তালি দিয়ে ওঠে) সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। আচ্ছা, দ্রৌপদীকে কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসাই করলে না। ...দ্রৌপদী, রাজার আদরের দুলালী, তখন হলো গে' পাণ্ডবদের সম্পত্তি। (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ২৫)

প্রকৃতার্থেই পাণ্ডবদের নিকট সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিলেন দ্রৌপদী। এ কারণেই যখন মাতা কুন্তী দ্রৌপদীকে পঞ্চপুত্রে ভাগ করে নেয়ার কথা বলায় অনুশোচনা বশে এর প্রতিকার চাইতে যান যুধিষ্ঠিরের কাছে, সহজ সমাধান মিলে না। বরং দ্রৌপদীকে রত্ন আখ্যা দিয়ে তাঁকে ভোগ করার প্রসঙ্গ পরবর্তীকালে বারবার উত্থিত হয়। *নিত্যপুরাণ* নাটকে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লাভের ঘটনাকে মাতৃআজ্ঞা, ঋষির ভবিষ্যতবাণী, পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে দেখে কামতাড়িত হওয়া কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার আবহে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি নাট্যকার। বরং স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুনের দ্রৌপদী জয়ের পরও পাঞ্চালীকে পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হতে হয়, সেই ক্ষোভের প্রকাশ নব্যকালের একলব্যের সামনে দ্রৌপদী করে এরূপে :

> ... স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন তাকে জয় করেছিল, অন্য কেউ নয়। দ্রৌপদীকে মুগ্ধ করেছিল অর্জুন, অন্য কেউ নয়। হঠাৎ কেন তবে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হয়ে গেল? ...পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হতে তার মত আছে কিনা, কেউ জিজ্ঞেস করেনি। শাস্ত্র কিংবা বিধান কেন দ্রৌপদীর ইচ্ছের মূল্য দেবে না? ...দ্রৌপদীর দুঃখে সহায় হবে এমন শাস্ত্র কিংবা বিধান কি তবে নেই? কেন দ্রৌপদী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাঁচজনের ভার্যা হবে সে? দ্রৌপদী বনিতা, বারবনিতা নাকি দ্রৌপদী? (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪৮)

সর্বদা পঞ্চপাণ্ডবের গরবিনী স্ত্রী পরিচয় দেয়া দ্রৌপদীর এই সংলাপে উন্মোচিত হয় আভিজাত্যের মুখোশে ঢাকা মানবী দ্রৌপদীর প্রকৃত দৈন্যতার রূপ। শুধুমাত্র অর্জুনকে বরমাল্য পরানোর পরও দ্রৌপদীর ইচ্ছার বিরূদ্ধে যুধিষ্ঠির, অর্জুন কিংবা শাস্ত্রের বিধান বাধ্য

করেছে দ্রৌপদীকে পাঁচজনকে পতি হিসেবে গ্রহণ করতে। মানবী দ্রৌপদী নিজেকে তাই সমাজের ইচ্ছাপূরণকারী এক বারবনিতা হিসেবে তুলে ধরছেন এই অধ্যায়ে।

৪.৪ শর্ত চাপানো দাম্পত্য-সম্পর্কে প্রেমাস্পদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা ও সপত্নীর আগমনে ক্ষোভ প্রকাশ

শুধুমাত্র পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হয়েই সমাজকে তৃপ্ত করতে পারেনি দ্রৌপদী, ভ্রাতৃবিরোধ এড়াতে দ্রৌপদীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয় শর্ত। এক পাণ্ডব যখন এক বর্ষ ব্যাপ্তিকাল দ্রৌপদীর সঙ্গসুখ পাবে, তখন অন্য পাণ্ডবরা থাকবে তার থেকে দূরে– শর্তভঙ্গের শাস্তি বারো বছরের বনবাস। অন্যদিকে এক বর্ষ অতিক্রান্ত হবার পর নারী দ্রৌপদী ফিরে পাবে তার কৌমার্য। পরবর্তী পাণ্ডব স্বামীর মনে যেন কোনভাবেই উত্থিত না হয়, পূর্ববর্তী স্বামীর অঙ্কশায়িনীরূপে দ্রৌপদী ছিল এক বর্ষকাল, তাই দেবপ্রদত্ত এই বিধি পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এভাবে সমাজ তার শর্তের পুতুল করে জীবন যাপনে বাধ্য করে দ্রৌপদীকে, *নিত্যপুরাণ* নাটকের একলব্য তাই দ্রৌপদীকে বলে :

> ...শর্তের অদৃশ্য কালো সুতোয় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা আপনি। ...একবছর ধরে দ্রৌপদী ভালবাসবে একজনকে, অবগাহন করবে তার জলে, আকুল আলিঙ্গনে, উষ্ণ নিঃশ্বাসে, সমুদ্র মন্থনের মত প্রেম জমবে শয্যায়, এক বছর। অতঃপর সবই শেষ, বছরের শেষ দিন শেষে নতুন পতি, নতুন প্রেম, নতুন শয্যা পুনরায়। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪৭)

নাথবতী অনাথবৎ নাটকেও উল্লেখ আছে দেবর্ষি নারদের পরামর্শক্রমে এক এক বছর করে জ্যেষ্ঠতার হিসাবে দ্রৌপদীর সঙ্গলাভ করবে পঞ্চপাণ্ডব। সর্বপ্রথম দ্রৌপদীর সাহচর্য পায় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ব্রাহ্মণের গো-রক্ষার জন্য অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে ঢুকে শর্তভঙ্গের শাস্তি লাভ করে, দ্রৌপদীর পরম আরাধ্য স্বামী অর্জুন। শর্তভঙ্গের শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত বারো বছরের বনবাসে ব্রহ্মচারীত্ব রক্ষা করে চলেননি অর্জুন। উলূপী, মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, কৃষ্ণ-ভগ্নি সুভদ্রা তার সঙ্গী হয়েছে। অপরদিকে অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের সবার সঙ্গেই ঘর করা ততদিনে হয়ে গেছে দ্রৌপদীর। কেবল প্রকৃতার্থে কৃষ্ণাবিজয়ী অর্জুনের সাহচর্য থেকে দূরে ছিলেন দ্রৌপদী। বারো বছর বনবাসের পর যখন অর্জুন এলেন, একা নয়– সাথে সুভদ্রাও ছিল। *মহাভারতে* অর্জুনের সঙ্গিনী সুভদ্রা আর দ্রৌপদীর সাক্ষাতের পূর্বে অর্জুন সামনে আসেন দ্রৌপদীর। বহুদিন পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী অর্জুনকে বললেন : "কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বার বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।" (ব্যাস, ২০০৯, পৃ. ৯৬)। অভিমানিনী দ্রৌপদীকে শান্ত হতে হয় অর্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা আর মিষ্টবাক্যে। অর্জুন সুভদ্রাকে রাজকীয় বসন-ভূষণ ছাড়িয়ে গোয়ালিনীর বেশে হাজির হতে বললেন দ্রৌপদীর সামনে। অর্জুনের কথায় সুভদ্রার এই দীনহীনের বেশ অভিনয় জানার পরও দ্রৌপদীকে ক্ষোভ বিসর্জন দিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মহান দ্রৌপদীর এই উদারতা যে আরোপিত, তার প্রমাণ সুভদ্রার প্রতি আশীর্বাদ বাক্যে মিলে। আশীর্বাদ করেন দ্রৌপদী এই বলে– যেন সুভদ্রার স্বামী নিঃসপত্ন হন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর অবস্থা যেন সুভদ্রা বা কাউকে বরণ করতে না হয়। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে অর্জুনের প্রবঞ্চনায় যে প্রতিবাদ অনুচ্চারিত ছিল পুরুষের কামুকতার বিরুদ্ধে, তা

উচ্চারিত হয় *নিত্যপুরাণ* নাটকে। পুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক অর্জুনের বহুপত্নী বরণের আড়ালের প্রকৃত সত্য তার নারীসঙ্গ লোভ তা উল্লেখ করে দ্রৌপদী বলে :

> ...নারীরে সে ভোলায় অনায়াসে, বিদ্ধ করে মোহে, তারপর লুট করে নেয় যেটুকু তার প্রয়োজন, অর্জুন ইচ্ছামত নেয়, এতটুকু দেয় না সে নারীকে। সুভদ্রা বা উলূপী অথবা চিত্রাঙ্গদা সকলেই ভার্যা তার দ্রৌপদীরই মত। ... চার ভার্যার কাছে অর্জুন সত্য কেবল শয্যায়, বাকি তার যা কিছু কথা, যা অনুভব সব ভাণ, ভনিতা। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪৯)

তারপরেও সত্য এই যে, দ্রৌপদী ভালবেসেছে একমাত্র অর্জুনকেই। অর্জুন ছাড়াও পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকেরই দ্রৌপদী ভিন্ন বহু স্ত্রী ছিল, কিন্তু সপত্নী-ঈর্ষাজনিত কোন কিছুর উল্লেখ দ্রৌপদী চরিত্রে পাওয়া যায় না । অর্জুনের প্রতি ক্ষোভ কিংবা ধিক্কার দ্রৌপদীর ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ, প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রাপ্তির বঞ্চনায় প্রতিবাদ।

৪.৫ অর্জুন-ভীমের ভালবাসার জটিল আবর্তে আটকে যাওয়া নারী

দ্রৌপদী যে প্রকৃতপক্ষে অর্জুনকেই ভালবেসেছিলো তার প্রমাণ *মহাভারতে* যেমন পাওয়া যায়, তেমনি *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকেও স্পষ্ট। অর্জুনের একান্ত সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের সাথে বনবাসে আসে আবার কিন্তু ব্যাসদেবের কথায় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্জুন যখন নির্দেশিত হন, দ্রৌপদী নিজের ভালবাসা আড়াল করতে পারে না : "-পার্থ! ...তুমি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকলে আমার কিছুতে সুখ থাকে না– না ধনে, না ভোগে, না জীবনে।" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৪৮) *নিত্যপুরাণ* নাটকে দ্রৌপদী-অর্জুনের ভালবাসার প্রসঙ্গ নাট্যকার সামনে এনেছেন কৌশলে। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কে অধিক ভালোবাসে দ্রৌপদীকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হলে, কৃষ্ণার অপূর্ব রূপের স্তব করে একলব্য নিজেই প্রার্থনা করে তার ভালবাসা। আজীবন ভালবাসার তৃষ্ণার্ত দ্রৌপদী যখন একলব্যের ভালবাসায় সাড়া দিতে এগিয়ে যায়, দ্বিতীয় পাণ্ডব নিজের ভালবাসা প্রকাশ করে। ভীমসেনের ভালবাসার স্বীকারোক্তিতেও দ্রৌপদীর মন দ্বিতীয় পাণ্ডবের প্রতি ভালবাসায় সিক্ত হয় না। কিন্তু যখন অর্জুনকে হত্যার উদ্দেশ্যে একলব্য প্রস্তুত, দ্রৌপদী ছুটে পালাতে চায় সর্জবন থেকে– প্রকাশিত হয়ে পড়ে ভালবাসা। এতক্ষণ ধরে পঞ্চস্বামীর প্রতি ভালবাসা সমান বলে দাবী করা দ্রৌপদীও অবশেষে স্বীকার করে :

> ...মোহ মুগ্ধতা কাটে তবুও ভালবাসা বেঁচে থাকে এসবেরই পাল্টানো খোলসের ভেতর। তখন আপন ভালবাসা কেবল কণ্ঠ চেপে ধরে। সূচাগ্রকণ্টক হয়ে বিদ্ধ করে আপনার হৃদয়। এ সেই ভালবাসা, একলব্য, সেই ভালবাসা..আঃ আহ্ ! (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪৯)

অপরদিকে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন যে দ্রৌপদীর প্রতি একান্ত অনুরাগ পোষণ করতেন তার বহু প্রমাণ যেমন *মহাভারতে* মিলে, তেমন *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকেও। প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ম্বর-সভায় যখন ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের মাঝে অর্জুনের দ্রৌপদী জয় নিয়ে কোন্দল শুরু হয়। অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মোকাবেলা করেন তাদের। ভীমসেনের ভ্রাতৃপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, তবে দ্রৌপদীকে দেখে স্বয়ম্বর-সভায় মোহিত হয়েছিলেন অন্য সবার সাথে দ্বিতীয় পাণ্ডবও। যুধিষ্ঠির যখন দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয়ে

একের পর এক ভাইকে পণ রেখে হেরে গেলেন, অন্য পাণ্ডবদের মত বিনা বাক্যব্যয়ে ভীমসেনও নেমে গেলেন ধুলোমাখা আসনে। কিন্তু যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলপূর্বক কুরুসভায় এনে উপস্থিত করে, ভীমসেন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হাত দগ্ধ করতে উদ্যত হন অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের। *মহাভারতে* উল্লেখ আছে অর্জুন যখন তপস্যার জন্য কাম্যকবন ত্যাগ করলেন, দ্রৌপদী অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তার কথা চিন্তা করে। দুর্গম পথের চিন্তা করে যুধিষ্ঠির অর্জুনের দর্শন লাভে দ্রৌপদীকে সাথে নিয়ে যেতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ভীম দ্রৌপদীর মনের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে তাকে নিয়ে যাবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ভাই হলেও অর্জুন ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভীমসেন তারপরও ভেবেছেন শুধু দ্রৌপদীর কথাই। অর্জুনের সাক্ষাত বিনা দ্রৌপদী অসুখী, অন্যদিকে দ্রৌপদীর সুখেই নিজের সুখ খুঁজেছেন ভীমসেন। *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে ভীমসেনের দ্রৌপদীর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ মিলে বনবাস কালে, জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণের প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনায়। অন্য পাণ্ডবরা জয়দ্রথের করুণ চেহারা দেখে, বোন দুঃশলার কথা চিন্তা করে দ্রৌপদীর অসম্মানের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু দ্রৌপদী যতক্ষণ না জয়দ্রথকে ক্ষমা করেছেন, ততক্ষণ সে নিষ্কৃতি পায়নি ভীমসেনের হাত থেকে। আবার অজ্ঞাতবাসের সময় রাজশ্যালক কীচকের দ্রৌপদীর সাথে অন্যায় ও অবিচারের শাস্তিও বিধান করেন ভীমসেনই। *নিত্যপুরাণ* নাটকে ভীমসেন দ্রৌপদীর প্রেমপ্রার্থী। দ্রৌপদীর স্বামীত্বের অধিকার তার কাছে তুচ্ছ, কারণ ভীমসেন জানে দ্রৌপদীর মন হরণ করেছে শুধুমাত্র অর্জুন– আর কেউ নয়। তাই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর একজন হয়েও ভীষণ একাকী ভীমসেন দ্রৌপদীর প্রতি তার অব্যক্ত ভালবাসার প্রকাশ করে এরূপে :

> আমার যা কথা...সযত্নে রেখে দেই মনেরই ভেতর। ...যখন এককোঁটা জায়গা থাকে না আর, উপচে পড়তে চায় তারা। আমি তখন অশথের কাছে যাই, অশথ বৃক্ষ, আমি যাকে সখা জ্ঞান করি। অশথ বৃক্ষ, সখা বৃক্ষ আমার, সব বোঝে সে আমার কথা, নিজের পাতায় পাতায় লিখে রাখে তার সব। এতদিনে আমি যা যা বলেছি তার সব লেখা আছে সে অশথের পাতায় পাতায়। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪১)

নিত্যপুরাণ নাটকে বাণ প্রতিযোগিতায় অর্জুনের পরাজয়ের পর, সর্জবনে দ্রৌপদীকে দেখে নিজের মৃত্যুচিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে দ্রৌপদীর পূর্বাপর বিপদের চিন্তায় অস্থির হয় ভীমসেন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন দ্রৌপদীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে শেষ স্পর্শ অনুভব করতে চায়, দ্রৌপদী ভীমসেনের দিকে এগিয়ে গিয়েও অর্জুনের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় পাণ্ডবকে উপেক্ষা করে দূরে সরে যায়। দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যানে মুষড়ে পড়েন ভীমসেন, কিন্তু তার ভালবাসা যে নিখাদ ও নিঃস্বার্থ এর প্রমাণ মিলে পরমুহূর্তেই। অনার্য নিষাদ একলব্যের কাছে শেষ প্রার্থনা জানান ভীম। প্রার্থনা করেন শুধু এতটুকু সময়, যতটুকু সময়ে হস্তিনাপুর গিয়ে গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ আর দুঃশাসনকে হত্যার মাধ্যমে দ্রৌপদীকে সারাজীবনের জন্য অসম্মানের হাত থেকে মুক্ত করে আবার ফিরে আসা যাবে। এতকিছুর পরও *নিত্যপুরাণ* নাটকে দ্রৌপদী নিজের ভালবাসার কাছে নত, ভালবাসাকাঙ্ক্ষী ভীমের ভালবাসার জবাব ভালবাসা দিয়ে দিতে অক্ষম এক মানবী।

নাথবতী অনাথবৎ এবং *নিত্যপুরাণ* উভয় নাটকেই পঞ্চস্বামীর সাথে দ্রৌপদীর ব্যবহার সম্পর্কে অনুপুঙ্খ কিছুর উল্লেখ নেই, আছে ইঙ্গিত। নাট্যকার শাঁওলী মিত্রের কথক ঠাকরুণ, মহাপ্রস্থানের পথে পতনের পর যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীর অর্জুনকে বেশি ভালবাসার অভিযোগের জবাবে বলেন : "সে তো চেষ্টা করেছে সমান ব্যবহার করতে।" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৭০)। অপরদিকে *নিত্যপুরাণ* নাটকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন-দ্রৌপদী-ভীম এই তিন মানব-মানবীর ভালবাসার এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয়। নাটকে একলব্যের প্রশ্নে দ্রৌপদী বলেছে : "...ধরা যাক দক্ষিণায়নের দিন, তখন যে বায়ু বর শীতল ঝিরঝির, সমান সে প্রাণ ঢেলে দেয় প্রত্যেকের নিঃশ্বাসে। ...এই ভালবাসা দিয়েই পাঞ্চালী ভালবাসে পঞ্চপাণ্ডবেরে।" (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৩৭)। মুখে যতই সমতার কথা বলা হোক, মানবী দ্রৌপদী যে পঞ্চপাণ্ডবকে একইরূপে ভালবাসতেন না, তার প্রকাশ পাওয়া যায় *নিত্যপুরাণ* নাটকে। যুধিষ্ঠিরের প্রতি পাঞ্চালীর ভালবাসার অধিক ছিল শ্রদ্ধা, ভীমসেন ছিলেন বিশ্বাস ও ভরসাস্থল, অর্জুনের প্রতি ছিল ভালবাসার পক্ষপাত আর নকুল-সহদেবের প্রতি ভালবাসার চেয়ে বেশি ছিল বাৎসল্য। সর্জবনে পঞ্চস্বামীর মুখোমুখি হওয়া দ্রৌপদীর আচরণেও তা স্পষ্ট :

> নিজের নরম দু'হাতের ভেতর অর্জুনের মুখমণ্ডল স্থাপন করে বলে 'অর্জুন', অতঃপর ভীমসেনের গ্রীবায় হাত রেখে বলে, 'ভীমসেন', যুধিষ্ঠিরের সামনে এসে দাঁড়ায় করোজোড়ে, 'যুধিষ্ঠির', তারপর নকুল, সহদেবের মাথায় হাত রেখে বলে, 'নকুল, সহদেব, প্রিয়পতিগণ আমার, বীরদর্পহীন একি রূপ দেখি আপনাদের!' (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৩৩)

ভালবাসার অর্জুনকে না পেয়ে দ্রৌপদীও ভীমসেনের মতো একই রকম একাকী। ভালবাসার বদলে প্রাপ্য ভালবাসার স্থলে দু'জনেরই জীবনে মিলে ভীষণ নিরুত্তাপ কর্তব্যপরায়ণতা নামের আদর্শ বুলি । কিন্তু পার্থক্য এই যে, *নিত্যপুরাণ* নাটকে ভীমসেনের ভালবাসা বিনিময় না পেয়েও অক্ষয় থাকে। অপরদিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রকৃত ভালবাসার মূল্যে ভালবাসা দিতে তৎপর হন *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে মহাপ্রস্থান পর্বে।

৪.৬ অসম্মানে ধর্মযুদ্ধ-প্রত্যাশী

মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র পরিচয়ে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে কালে কালে তা হল, দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ে দ্রৌপদীকে কৌরব রাজসভায় জোরপূর্বক টেনে এনে বস্ত্রহরণের চেষ্টার দ্বারা অসম্মানিত করা। এ প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে উঠে এসেছে *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে। দুর্যোধনের নির্দেশে প্রাতিকামী আসে, দ্রৌপদী ফেরত পাঠায় এই বলে :

> "সূতপুত্র! তুমি সভায় যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, আপনি কি প্রথমে নিজেকে হারিয়েছেন না, আমাকে? সূতপুত্র! এই প্রশ্নের উত্তর তুমি জেনে এসো, তারপর আমাকে নিয়ে যেও। আমি সেই রাজার অভিপ্রেত বিষয় বুঝে, তারপর দুঃখিত মনে যাব।" (ভট্টাচার্য, ২০১০, পৃ. ২২০)

যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রাখার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন, ততক্ষণে ধর্মপুত্র স্বাধীন নন অতএব, দ্রৌপদীর উপর তাঁর অধিকার নেই। দ্রৌপদীর যুক্তি খণ্ডনের অযোগ্য তারপরও দুঃশাসন এসে জোরপূর্বক তাঁর কেশ-আকর্ষণ করে কৌরব রাজসভায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের সামনে দ্রৌপদী নত হয়ে অনুনয় করে : "আঃ, দুঃশাসন, আমার কেশ ছেড়ে দাও, আমাকে সভায় নিয়ে যেও না। পায়ে পড়ি, দয়া কর, দয়া কর আমাকে। ...আমি রজস্বলা, একবস্ত্রা হয়ে আছি- এই অবস্থায় আমাকে সভায় সবার সমক্ষে নিয়ে যেও না।" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৩৬-৩৭)। তারপরও দুঃশাসন দ্রৌপদীকে টেনে সভায় এনে হাজির করে। ক্রোধান্বিতা রাজকুলবধূ দ্রৌপদী তার এই অসম্মানে সভায় উপবিষ্ট গুরুজনদের চুপ করে থাকতে দেখে আর্ত-চিৎকার করে নিন্দা জানায়। প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণের দল দ্রৌপদীকে বিদ্রুপ করে হেসে ওঠে। পাঞ্চালীর অপমানে যুধিষ্ঠিরের উপর ক্রোধে জ্বলে উঠতে দেখা যায় কেবল ভীমসেনকে। দ্রৌপদীর প্রিয়তম স্বামী অর্জুন নীতিবাক্যে ভীমসেনের ক্রোধ নিবৃত্ত করেন। পাপাত্মা দুর্যোধন উরুর আচ্ছাদন সরিয়ে দ্রৌপদীকে নোংরা ইশারা করে, কর্ণের সাথে গলা মিলিয়ে বলে : "যে পঞ্চস্বামীকে ভজনা করতে পারে সে তো বেশ্যা! সে আজকে বিজিত, সে আমাদেরও ভজনা করবে!" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৩৮)। এমন বিরূপ পরিস্থিতিতেও দ্রৌপদীকে ক্রোধে ফুঁসে উঠতে দেখা যায়, যুক্তি তর্কে নিজেকে অবিজিতা হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। কিন্তু কৌরব সভা অনিরপেক্ষ, তা আবারো প্রমাণিত হয়। কর্ণ নির্দেশ দেয় দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের। দুঃশাসন এগিয়ে এসে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করলে মহামতি বিদুর মহাঅন্যায় এই কর্মকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। তারপরও সভা নিশ্চুপ ছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত দৈব দ্রৌপদীর প্রতি সহায় হয়। রাজসভায় চারিদিক থেকে অমঙ্গলের শব্দ ভেসে আসায় রাজ্য ধ্বংসের ভয়ে ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়ে সব ফিরিয়ে দিলেন। ধীবুদ্ধি, তেজস্বিনী দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রের দুই বরে ফিরে পেলেন যুধিষ্ঠির এবং বাকি পাণ্ডবদের; কিন্তু হারালেন সম্মান। যে অসম্মান দ্রৌপদীকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে আজীবন। তারপরেও আবার সেই দ্যূতক্রীড়া আবার বনবাস-অজ্ঞাতবাস। *নিত্যপুরাণ* নাটকে কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদীর অসম্মানকে সরাসরি তুলে ধরেননি নাট্যকার, ভীমের সংলাপে যুধিষ্ঠিরের অন্যায়ভাবে দ্রৌপদীকে পণ রাখা ও ক্রোধান্বিত দ্বিতীয় পাণ্ডবের প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহাকে রুখে দেয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেন শুধু।

মহাভারতে দ্রৌপদীর জন্মকথায় উল্লেখ আছে যজ্ঞীয় আগুন থেকেই কুমারী পাঞ্চালীর আবির্ভাব, জন্মের অলৌকিকত্বের আগুন তাই দ্রৌপদী চরিত্রেও বিদ্যমান। দ্রৌপদী চরিত্রের তেজস্বীয়তার পরিচয় *মহাভারতের* বহু স্থানেই যেমন পাওয়া যায়, *নাথবতী অনাথবৎ* এবং *নিত্যপুরাণ* নাটকেও এর প্রমাণ মিলে। সর্বদা পঞ্চপাণ্ডবের দুঃখের ভাগীদার দ্রৌপদীকেই ক্রোধে জ্বলে উঠতে দেখা যায় বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিশোধপরায়ণতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখে। কুপিতা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করে এরূপে :

> কথক- দ্রৌপদী : রাজা, তুমি চীরধারী হয়েছ না? ...তোমার ভাইয়েদের কষ্ট দেখে তোমার কষ্ট হয় না? তারা কেবল তোমার জন্য কষ্ট করছে। ...রাজা, তুমি না ক্ষত্রিয়? তোমার ক্রোধ নেই? তোমার তেজ নেই? রজঃস্বলা আমাকে যখন সভার মধ্যে ঐভাবে টেনে নিয়ে

> এসে ফেলল তখন তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখনি? আমার অপমানে তোমার অপমান হয়নি? (মিত্র , ১৩৯৮, পৃ. ৪৯-৫০)

ভর্ৎসনার দ্বারা ক্ষাত্রনারী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয়ত্ব জাগিয়ে তুলতে তৎপর হয়, কিন্তু জবাবে শান্তিকামী যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে প্রজ্ঞা দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত করে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। সেই কৌরব রাজসভা থেকে অসম্মান বয়ে বেড়ানো দ্রৌপদীর জানা হয়ে যায় যুধিষ্ঠির দৈবের জন্য অপেক্ষারত। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের চেয়ে রাজত্ব লাভ নিয়ে বেশি চিন্তিত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। শেষ আশ্রয় সখা কৃষ্ণের মুখোমুখি হয় দ্রৌপদী। অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হবে, রাজত্বও মিলবে এমন প্রবোধ মিলে। তার জন্য তো ধর্মযুদ্ধ চাই কিন্তু কৃষ্ণতো সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী। সন্ধির মাধ্যমে দ্রৌপদীর অসম্মানের প্রতিশোধ গ্রহণ অসম্ভব! তাই কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয় দ্রৌপদী, পঞ্চ স্বামী-প্রিয় সখা কৃষ্ণ থাকা সত্ত্বেও সে প্রকৃতার্থে অনাথিনী। সমুদ্রসম কষ্ট বুকে চেপে ধর্মযুদ্ধ-প্রত্যাশী দ্রৌপদী সন্ধিকামী সখাকে নিজের অসম্মান শেষবারের মত স্মরণ করিয়ে দেয় :

> কথক দ্রৌপদী ঃ এই সেই কেশ কৃষ্ণ। যে কেশ আকর্ষণ ক'রে আমাকে দুঃশাসন ঐ কৌরবসভার মধ্যে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ সভাতেই গিয়ে ব'সে তুমি যখন শান্তির কথা বলবে, সন্ধির কথা বলবে, এই কেশের কথা যেন তোমার মনে পড়ে।
>
> যেন তোমার মনে পড়ে দুর্যোধন ঐ সভায়, আমার পঞ্চস্বামীর সামনে, তার উরুর কাপড় সরিয়ে উরু দেখিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করেছিল। ...চীৎকার ক'রে বলে উঠেছিল যে, যে পঞ্চস্বামীরে ভজনা করতে পারে সে তো বে-...
>
> যেন তোমার মনে পড়ে যে কর্ণ বলেছিল, ঐ সভায়– 'ঐ নারীর বস্ত্র হরণ করো এই সভায়, সবার সামনে, আমরা সব দেখবো।' আমি দেখলাম, দুঃশাসন সত্যিই উঠে এল! আমার বসন ধরে টানল! একবস্ত্রা আমাকে! ...আমি নাকি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ। ইন্দ্রসম পঞ্চপাণ্ডব আমার স্বামী। তুমি কৃষ্ণ, তুমি তো আমার সখা, তাই না? মনে রেখো কৃষ্ণ, তোমরা সবাই যদি আমার অপমানের কথা ভুলে যাও, আজ আমার পঞ্চপুত্র আছে, তারা তাদের জননীর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৬১-৬২)

এই উচ্চারণে প্রকৃতার্থে অনাথিনী দ্রৌপদীর বেঁচে থাকা গর্বিত মাতৃসত্তার পরিচয় যেমন মিলে, তেমনি যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর পরিচয়ও দৃষ্ট হয়। যেমন মিলেছিল কৌরব রাজসভায় নিজেকে বিজিত বলে না মানায়, ভীষ্ম যখন সন্তুষ্ট হয়ে তৃতীয় বর দিতে চেয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে দেয়ায়।

৪.৭ কালের কথক দ্রৌপদী

জয়দ্রথকে ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষণায়, বিরাটরাজসভায় কীচকের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্পসহ এমন অনেক ঘটনায় মিলে দ্রৌপদীর ব্যক্তিসত্তার পরিচয়। দ্রৌপদীর নিজ অসম্মানের প্রসঙ্গ বার বার উত্থাপন করে সন্ধি স্থাপনে অসম্মতি জানালে যুধিষ্ঠিরের মতই ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে প্রশমিত করতে বলেন সখা কৃষ্ণও। পঞ্চস্বামী, সখা সবাই বিবেচনা

করতে বলেন রাজনৈতিক দিক দিয়ে সবকিছুকে। এ প্রসঙ্গে মানবী দ্রৌপদীর যে সত্যভাষণ তা কাল অতিক্রম করে স্পর্শ করে বর্তমানকেও :

> কথক- দ্রৌপদী : আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অপমান ভুলে যাই সখা কৃষ্ণ, তবে কি ধর্মরাজ্য আসবে পৃথিবীতে? তুমি কি এই অঙ্গীকার করতে পারো, যে তাহলে আর কোনো নারী ভবিষ্যতে অনুরূপভাবে লাঞ্ছিতা হবে না, উৎপীড়িতা হবে না? ...যদি এই অঙ্গীকার আজ তুমি আমাকে করতে পারতে কৃষ্ণ, আমি সব ভুলে যেতাম তাহলে। (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৬৩)

তারপরও দ্রৌপদীর অসম্মানে যুদ্ধ ঘোষিত হল না, বরং সন্ধিপ্রস্তাব গেল কৌরবকূলে। এমনকি দ্রৌপদীর একান্ত অনুগত ভীমও সম্মত হল এই প্রস্তাবে যে– পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দিলেই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব । যুদ্ধ অনিবার্য হল দুর্যোধনের অসম্মতিতে। দ্রৌপদীর বহু আকাঙ্ক্ষার এই যুদ্ধ ঘোষণা দু'টি বিষয়কে অন্তত স্পষ্ট করে উপস্থাপন করে– রত্ন নামে অভিহিত করে পাঁচ ভাই যে নারীর স্বামী হয়েছিল, তাদের অল্প সুখ আর বহু দুঃখের সাথী হয়েও দ্রৌপদী তাদের একজন বা তাদের সম্মানের পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। পাঁচটি গ্রাম পাওয়ার জাগতিক মূল্য নারীর অসম্মানের থেকে বেশি। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে আজ অবধি ঘটে যাওয়া নারীর উপর সমাজের চাপিয়ে দেয়া ইচ্ছাকৃত অবিচার যখন চিহ্নিত হয়, আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয় না; তখন ক্ষমা প্রার্থনায় বা প্রদর্শনে তা এড়ানোর পথ খুঁজেছে পুরুষ। বিপরীতে নারীরূপী দ্রৌপদী যখন কৃষ্ণরূপী সমাজের কাছে ক্ষমার বিনিময়ে এ ধরনের অবিচার আর না হওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছে, তার ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায়নি।

৪.৮ শোকাভূতা দ্রৌপদীর জীবনে বৈরাগ্য

ক্ষাত্রনারী দ্রৌপদী সন্ধিবিরোধী ছিলেন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ধর্মযুদ্ধ বহু প্রার্থিত ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু এই প্রলয়রূপী যুদ্ধে দ্রৌপদী ধর্ম, ন্যায় তথা জীবনের বিরুদ্ধাচরণের সাক্ষী হলেন। দেখলেন– কৌরবরা অন্যায়ের আশ্রয় নিল, এমনকি কৃষ্ণের ইশারায় পঞ্চপাণ্ডবও। পিতা দ্রুপদ, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভগ্নি শিখণ্ডী নিহত হলেন; নিজ পুত্রসম সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু হত হল। এমনকি শান্তিঘোষণার পরও তাঁর পঞ্চপুত্রকে রাতের আঁধারে হত্যা করা হল। রাজ্যনাম্নী মহাশ্মশান জুড়ে শুধু তাঁর মতো পিতা-ভ্রাতা-পুত্রহারা অনাথ আর বিধবাদের ভীড়। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি দ্রৌপদীর মনে এক ভিন্ন উপলব্ধির জন্ম দেয়। পুত্রহীন, পিতা-ভ্রাতাহীন এই নারীর জীবনে প্রবল শোক থেকে বৈরাগ্যের জন্ম নেয়। ঐশ্বর্য, বৈভব সবকিছু মূল্যহীন ঠেকে তাঁর কাছে। যুদ্ধের বিপরীত দুই রূপ প্রত্যক্ষণে ম্রিয়মাণ *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকের কথক দ্রৌপদী বলে :

> ধর্ম কোনদিকে? ন্যায় কোনদিকে? এ কোন্ রাজ্যের রাজ্ঞী হবে সে? কোথায় সে সম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে বাবুমশায়রা? এই মহাশ্মশানে, যেখানে কেবল পুত্রহারা মাতা আর বিধাব রমণী চোখে পড়ে! (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৬৪)

৪.৯ জীবনের শেষপ্রান্তে ভীমের ভালবাসায় আত্মসমর্পণ ও পরজন্ম অভিলাষ

পঞ্চস্বামী ভার্যা হয়েও অর্জুনের একান্ত ভালবাসার আকাঙ্ক্ষী, দুঃশাসন-দুর্যোধন-জয়দ্রথ-কীচক দ্বারা অসম্মানিতা, অন্যায়ভাবে নিহত পঞ্চপুত্রের দুঃসহ শোকবহনকারী দ্রৌপদীর মানবী জীবন যেন সমুদ্রসম কষ্টের সমাহার। পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে তাই বরাবরের মতই সঙ্গী হলেন দ্রৌপদী, পথিমধ্যে হঠাৎ পতন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাই পাপী দ্রৌপদীর এই শাস্তি। *মহাভারতে* এরপর আর দীর্ঘায়িত হয়নি দ্রৌপদী কাহিনি। কিন্তু *নাথবতী অনাথবৎ* এর নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন মারাঠী লেখিকা ইরাবতী কার্বের লেখনী দ্বারা। সম্মানীয়া কার্বে *মহাভারতের* কাব্যমূল্যকে বিবেচনায় রেখে চরিত্রগুলোকে মানবিকতা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, নাট্যকার শাঁওলী মিত্রের এই নাটকেও তাই প্রতিফলিত হয়। দ্রৌপদীর পতনে যুধিষ্ঠিরের ভাষ্যকে কথকরূপী দ্রৌপদী তাই সস্নেহে বিশ্লেষণ করে এভাবে :

> "...এতদিন পরে, ধর্মরাজের প্রতি রাগ, অভিমান সব ছাপিয়ে বড় করুণা হ'লো দ্রৌপদীর। ...এই লোকটা যে নিজেকে এইরকম বঞ্চিত বলে মনে করেছে চিরদিন, সে তো কখনো তা বুঝতে পারেনি!" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৬৯)

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে চিন্তা করলে তাঁর ক্ষোভ অবান্তর নয়। কিন্তু এই চিন্তা তো দ্রৌপদী লাভের পর আসে, তাকে তো অর্জন করেছিল অর্জুন– আর কেউ নয়। যখন দ্রৌপদীকে গ্রহণ করতে হয় পঞ্চপাণ্ডবকে, তখন তো দ্রৌপদীর কষ্টে বেদনা অনুভব করেননি যুধিষ্ঠির। নিজেকে পাঁচভাগে সমানভাবে বিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে দ্রৌপদী করেছেনও, কিন্তু মনতো কারো বশীভূত নয়। দ্রৌপদী সবচেয়ে ভালবেসেছিলো অর্জুনকেই একথা সত্য, কিন্তু তার বিনিময়ে অর্জুনের নির্লিপ্ততা ছাড়া মিলেনি কিছুই। কথক তাই বলে : "...আচ্ছা, ভালোবাসা কি সবসময়ে এইরকমই? এক পক্ষের? আমি একজনকে ভালবেসে মরি, সে আমাকে ফিরেও দেখে না। আবার আর কেউ হয়তো আমাকে–" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ.৭১)– এবারও গভীর ভালবাসায় ভীমসেন এসে দাঁড়ায় দ্রৌপদীর সামনে। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে নিজেকে আর ভীমসেনকে ভালবাসার জন্য একই রকম তৃষ্ণার্ত মনে হয় দ্রৌপদীর। শ্রীমতি ইরাবতী কার্বে দ্রৌপদীর হয়ে লিখেছিলেন : "সামনের জন্মে পাঁচ জনের বড় ভাই হয়ো ভীম! তোমার আশ্রয়তলে আমরা সকলে নির্ভয়ে আনন্দে থাকব!" (কার্বে, ১৯৯৮, পৃ. ৬৩) লেখিকার কল্পনায় দ্রৌপদীর পরের জন্মের এই অভিলাষ, ভালবাসার বড় বলয়ে আবদ্ধ থাকা আভিজাত্য থেকে নিষ্কৃতি দেয় না কৃষ্ণাকে। কিন্তু *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকের দ্রৌপদী পরজন্মে পঞ্চস্বামী লাভের কল্পনার ভাগীদারও হতে ইচ্ছুক নয়। *নিত্যপুরাণ* নাটকে অর্জুনের প্রতি ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করে ভীমসেনের বাড়ানো ভালবাসার হাত ধরা হয়নি দ্রৌপদীর। কিন্তু *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে ভীমের মুখ দু'হাতে স্পর্শ করে দ্রৌপদী শেষ উচ্চারণ করে : "আর জন্মে কেবল তুমি আমার হ'য়ো ভীম। তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি তবে একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবো।" (মিত্র, ১৩৯৮, পৃ. ৭৩)। যে ভালবাসাকে দাম্পত্য-সম্পর্কে এড়িয়ে গেছেন, আজন্ম তৃষ্ণার্ত দ্রৌপদী তাতেই শান্তিলাভের আশায় আত্মসমর্পণ করেন জীবনের শেষ মুহূর্তে। ভালবাসা গ্রহণের মাঝেই ভালবাসার প্রকৃত সুখ খুঁজে নেন। দ্রৌপদীর

নিজেকে সমর্পণের এই চিত্র *নিত্যপুরাণ* নাটকে নাট্যকার না দেখালেও ভালবাসায় যে দ্রৌপদীর আজন্ম তৃষ্ণা তার প্রকাশ ঘটান। নিষাদ একলব্য দ্রৌপদীর ভালবাসার কাঙ্গাল হয়ে যখন বলে :

> ভালবাসা দ্রৌপদী, ভালবাসা। ...অরণ্যচারী আমি, একা, না বেসেছি ভাল, না পেয়েছি ভালবাসা কারও। ভালবাসা চাই, দ্রৌপদীর ভালবাসা, এক ফোঁটা ভালবাসা দ্রৌপদীর। ওই আঙ্গুলীপঞ্চকের যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ, তার নখ থেকে তুলে দেওয়া এক ফোঁটা ভালবাসা। দুর্বাঘাসের ডগায় এক বিন্দু শিশিরের মতো। সে ভালবাসা দিয়ে দ্রৌপদী, পূর্ণ করুন একলব্যের শূন্য হৃদয়। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৪৪)

নিত্যপুরাণ নাটকে কড়ে আঙ্গুল থেকে খুলে দেয়া অঙ্গুরীয়ের মাধ্যমে অনার্য একলব্যের ভালবাসার স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন দ্রৌপদী, বাধা দেয় পাণ্ডবরা। কিন্তু নাট্যকারের কল্পসৃষ্ট এই ঘটনা দ্রৌপদীর ভালবাসার তৃষ্ণার্ততার কথা ঠিক জানান দেয়।

৪.১০ শৃঙ্খলিত দ্রৌপদী

দ্রুপদ-কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্ন-ভগিনী, পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা, কৃষ্ণসখী এমন লক্ষ পরিচয়ের রাজনারী দ্রৌপদী। পূর্বজন্মের হিসাবে পাঞ্চাল রাজের গৃহে যজ্ঞের অগ্নি থেকে পূর্ণ যৌবনাবস্থায় তাঁর জন্ম বা আবির্ভাব। স্বয়ম্বর-সভায় নারী নিজ পছন্দমত পুরুষ বেছে নেয় জীবনসঙ্গী হিসেবে, কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অন্যরূপ। জামাতা কিংবা বোনের পতি হিসেবে যে প্রার্থিত– তাকে উপলক্ষ্য করেই যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা। দ্রৌপদী শৃঙ্খলিত পিতা-ভ্রাতার রাজনৈতিক চালে। কর্ণ অপ্রার্থিত, তাই তার বীরত্ব বর্ণের পরিচয়ে পরিত্যাজ্য। দ্রৌপদী শৃঙ্খলিত, কারণ তাঁর মনের আয়নাতে বীর কর্ণের বীরকান্তি রূপ স্থায়ী আক্ষেপে রক্ষিত, কিন্তু সমাজের চোখে তা ভ্রষ্টা নারীর পরিচায়ক। তাই তা গোপন পাপের ন্যায় গোপনেই রাখতে হবে। পঞ্চস্বামীর পাণিগ্রহণে বাধ্য হয় দ্রৌপদী, মানে নারীর বারবনিতা জীবনে বৈধতা দিল সমাজ। পঞ্চপাণ্ডব, পিতা-ভ্রাতা শুধু এর পক্ষের কারণ দেখলেন, বিবেচনা করলেন কিন্তু ফলভোগ করতে হলো একা এক নারী দ্রৌপদীর। এখানেও দ্রৌপদী সমাজের নিয়মে বাঁধা– শর্তসাপেক্ষ দাম্পত্য-সম্পর্ক, বর্ষব্যাপী জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে স্বামীসঙ্গলাভ। যার প্রেম লাভে উন্মুখ, সে শাস্তিকে ভোগে পরিণত করে ফিরে আসে। সমাজের নিয়মে বাঁধা দ্রৌপদীকে স্বামীর স্ত্রীকে মেনে নিতে হয়, কারণ সমাজের নিয়মে বহুদার গ্রহণ পুরুষের পক্ষে দোষের নয়। কুরুসভায় পরাজিত যুধিষ্ঠির পণ রেখে নিজসহ একে একে হারালেন বাকি পাণ্ডবদের। এবার পণ রাখা হল দ্রৌপদীকে। স্বাধীনতা হারানো পুরুষও স্ত্রীর উপর অধিকার হারায় না, স্বামীত্বের অধিকারে স্ত্রী তার বশীভূত সবসময়। এখানেও শৃঙ্খলিত দ্রৌপদী। স্বামীর দোষে অসম্মানিত হওয়া দ্রৌপদী যুদ্ধ যুদ্ধ করে ব্যতিব্যস্ত হয়, কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে না। যে ভীম দ্রৌপদীর কোনো অপমান সহ্য করতে ব্যর্থ, তিনিও যুদ্ধের বদলে শান্তিকে বেছে নেন। স্বামী সম্পত্তি-জ্ঞানে স্ত্রীকে পণ রাখলে সমাজ তাকে ধিক্কার জানায় না, কিন্তু স্ত্রীর সম্মানহানি হলে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি শ্রেয় বলে নির্দ্বিধায় চুপ থাকে। জীবনভর স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যখন স্ত্রীর সম্মান চেয়ে প্রতিকার চাইল দ্রৌপদী, সবাই শান্তি শান্তি বোলে ব্যস্ত

হল। এ অসম্মান যেন হওয়ার যোগ্য কোন ঘটনাই স্ত্রীর জন্য। রাজনারী দ্রৌপদী এখানেও শৃঙ্খলিত। কিন্তু দ্রৌপদী যখন কালের কথকরূপে অঙ্গীকার চায় তার অপমান ভোলার ফলস্বরূপ পৃথিবীতে নারীর উপর আর অপমানের বোঝা চাপবে না– কারও কাছ থেকে কোন জবাব মিলে না। কারণ তারা জানে, নিজ সৃষ্ট শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্তি দেয়া অসম্ভব পুরুষের পক্ষে। পঞ্চপাণ্ডব তথা সমাজ শুধু সত্যভাষণ বা ভালবাসা প্রকাশে দ্রৌপদীকে বাধা দিয়ে নিজের পুরুষতান্ত্রিকতার প্রকাশ ঘটায়নি, সাথে প্রমাণস্বরূপ যুক্ত করেছে নারীর শৃঙ্খলতার এক সাধারণ চিত্রও। *নিত্যপুরাণ* নাটকে চতুরতায় একলব্যকে শৌর্যহীন করতে উদ্যত হয় যখন দ্রোণাচার্য ও পঞ্চপাণ্ডব, পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী দ্রৌপদী অগ্রসর হয় তাকে বাঁচাতে। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কুটিলতা আর চাতুর্যে বিনাযুদ্ধে জিতে যায় একলব্যের বিরুদ্ধে পাণ্ডবরা। একলব্যের শিরে রাখতে যাওয়া দ্রৌপদীর মমতার হাত পর্যন্ত লোক সমাজের ভ্রষ্টা পরিচয় আর নরকের অগ্নির উত্তাপের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেয় স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। *মহাভারতের* অসামান্য বিশেষণের দ্রৌপদীর সাথে সাধারণ নারীর কোনো পার্থক্য সত্যিই আর থাকে না।

৪.১১ দ্রৌপদী চরিত্র বিশ্লেষণে গবেষকগণ

মহাভারতের বিচিত্র চরিত্র কালে কালে লেখক, পাঠক ও গবেষকের মনে ভাবনার উদ্রেক করেছে; খুলতে বাধ্য করেছে নবচিন্তার দুয়ার। তাই সাহিত্যে *মহাভারত*কেন্দ্রিক বিনির্মাণ, পুনর্নির্মাণের অভাব নেই। তেমনি গবেষকরাও মহাকাব্যটির চরিত্র ও ঘটনাবলির নব নব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ঋদ্ধ করে চলেছেন গবেষণা জগত। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গবেষণার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানব-চরিত্রকে তাঁর স্বাভাবিকতায় অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। বরং চাপিয়ে দেয়া বৈশিষ্ট্য ও মনুষ্য-উর্ধ্ব গুণে মানুষটিকে অতি মানবীয় প্রমাণ করার চেষ্টা দৃষ্ট হয়। দ্রৌপদী চরিত্রের ক্ষেত্রে তা অতিমাত্রায় প্রযোজ্য। *মহাভারতের চরিতাবলী* গ্রন্থে গবেষক শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য দ্রৌপদীর জীবনকে পর্যালোচনা করে বলেছেন :

> যজ্ঞাগ্নি মহীয়সী কৃষ্ণা চিরদিনই ক্ষাত্রতেজের প্রতিমূর্তি। তাঁহার প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তি অসামান্য। ভক্তিমতী ও সহিষ্ণু এই নারী কখনও আপন কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই। দৈবক্রমে পাঁচ-জন বীরপুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াও তিনি পতিব্রতার আদর্শ-স্থানীয়া। (ভট্টাচার্য, ১৩৭৩, পৃ. ৩৬৯)

অপরদিকে ননীগোপাল চক্রবর্তী তাঁর *মহাভারত প্রসঙ্গ: চরিত্র* গ্রন্থে দ্রৌপদী চরিত্র বিশ্লেষণ শেষে বলেন :

> দ্রৌপদী ছিলেন সৌন্দর্যের অপরূপ প্রতিমা; কিন্তু নানাবিধ গুণে বিভূষিতা। পাতিব্রত্য, কর্মনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা, পাণ্ডিত্য, সখ্যপ্রীতি, সর্বোপরি ক্ষত্রিয়াণীসুলভ নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা তাঁর চরিত্রকে দান করেছে এক অনন্য বিশিষ্টতা। অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত নৈষ্ঠিক ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন তিনি। ...পুণ্যবতী রমণীগণের মধ্যেও অন্যতমারূপে তাঁর শাশ্বত স্বীকৃতি। (চক্রবর্তী, ২০১১, পৃ. ৩৫১)

মহাভারতের নারী গ্রন্থে দ্রৌপদীর সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনায় ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন :

> ...চতুঃষষ্টি কলানিপুণা অনবদ্যঅঙ্গী নারী। তেজস্বিতায়, মননে, চিন্তায় যাঁর তুল্য নারী পৃথিবীর কোনও মহাকাব্যেই রচিত হয়নি। ...দ্রৌপদীকে অগ্নি সারাজীবন বইতে হয়েছে। ...দ্রৌপদীকে অসম্মান করে কীচক সবংশে ধ্বংস হলেন, কৌরবরা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলেন। ...স্বয়ম্বরসভায় সূতপুত্রকে বিবাহ করতে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে তিনি বলেন, "নাহং বরয়ামি সূতম।" ...পুরুষের কামনার কদর্যরূপ তিনি দেখলেন হস্তিনাপুরের রাজসভায়। দ্রৌপদী তেজস্বিনী, বাগ্মীশ্রেষ্ঠা, বিদূষী এবং সবলা নারী। ...ভুবনবিজয়ী পাঁচ স্বামীকে দ্রৌপদী কোনও অসতী নারীর মতো জটিকা-বুটিকা মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বশ করেননি– বশ করেছিলেন তাঁর সদাসর্বদা সতর্ক পরিচর্যা ও গৃহিণীপনায়। ...মননশীলতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, যে-কোনও বিপদে মুখোমুখি হওয়ার সাহস, স্বামীগর্বে গর্বিতা দ্রৌপদী তাই মুণীঋষিদের চোখেও মহাভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্তর্গত। (ভট্টাচার্য, ২০১০, পৃ. ২৭৪-২৭৫)

দ্রৌপদী চরিত্রের বিপরীত দিক বিশ্লেষণ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর *ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন* গ্রন্থে। কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামা যখন দ্রৌপদীর কাছে স্বামীদের কাছে প্রিয়া হবার কৌশল জানতে চান, কৃষ্ণার জবাবের সারার্থ দাঁড়ায় এমন :

> স্বামী স্ত্রীকে পছন্দ না করে পারবে না, স্ত্রী যদি স্বামীর ছায়া হন; সপত্নীদের সঙ্গে স্বামীর (তাঁর নিজের ক্ষেত্রে স্বামীদের) সেবা করেন, অন্যপুরুষ কামনা না-করেন, সকলের আগে জাগেন এবং সবার শেষে ঘুমান, প্রসাধন করেন এবং সবার খাওয়া শেষে যা বাঁচে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। (চৌধুরী, ২০০০, পৃ. ৪৭)

বলাবাহুল্য *মহাভারতে*র দ্রৌপদীও তাঁর স্ত্রীধর্ম রক্ষার্থে এভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছেন। যজ্ঞাগ্নিতুল্য প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, পঞ্চস্বামীর গর্বিত স্ত্রী যে উপাধিতেই ভূষিত করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবন সাধারণ নারীর মতই। সমাজের নিষ্ঠুরতা তাঁর প্রতিও বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং স্থানবিশেষে অধিক। সেই নিষ্ঠুরতা কতটা অধিক প্রমাণিত হয় আত্মপক্ষ সমর্থনে দ্রৌপদীর সুপারিশে।

৫. গবেষণা ফল

প্রখ্যাত অভিনেত্রী শাঁওলী মিত্র *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে আমার নিবেদন নামক প্রস্তাবনায় সরলভাবে ইরাবতী কার্বের *যুগান্ত* বইটির কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। নাট্যকার অকপটে বলেন *যুগান্ত* পাঠের পর মহাভারত নবভাবে পাঠ এবং অনুধাবন বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। ফলশ্রুতিতে দ্রৌপদী নাম্নী এক মানবীকে সর্বকালের নারীর হয়ে কিছু বলতে শোনা যায় *নাথবতী অনাথবৎ* নাটকে। নাট্যকার বলেছেন : "...দ্রৌপদীর মত অনেককেই যুগে যুগে কষ্ট সইতে হয়েছে কি-না, এখনো সইতে হয় কি-না সে বিচার করবেন পাঠক।" (মিত্র, ১৩৯৮, 'আমার নিবেদন')। অপরদিকে নাট্যকার মাসুম রেজা তাঁর *নিত্যপুরাণ* নাটক রচনার অভিপ্রায়ে স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

> আমি মূলত দ্রৌপদীর মানসলোকের দুয়ার খোলার চেষ্টা করেছি। দেখতে চেয়েছি দ্রৌপদীরও স্বপ্ন ছিল, ছিল ভাল লাগা না লাগার অনুভূতি, যা সর্বকালের সব মানুষের মধ্যে ছিল এবং থাকবে। ...মূল কথা হল দ্রৌপদী প্রথমত মানুষ তারপর নারী। (রেজা, ২০০৪, পৃ. ৭)

উভয় নাট্যকার প্রায় এক অভিপ্রায়েই দ্রৌপদী চরিত্রকে তুলে ধরেছেন তাঁদের নাটকে। মাসুম রেজার দ্রৌপদী নারীর প্রতি অন্যায় মানতে বাধ্য হওয়া কিন্তু বিদ্রোহী, ভালবাসার বিনিময়ে নির্লিপ্ততা প্রাপ্তিতে ক্ষিপ্ত কিন্তু অন্যের নিখাদ ভালবাসায় নিজেকে নিবেদন করতে না পারা অক্ষম ও অসহায় এক মানুষ। আবার নাটকের শেষ পর্যায়ের পরপর দুইটি ঘটনায় দেখা মিলে বিনা অপরাধে শাস্তি পাওয়া এক মানবের মাথায় মমতার হাত পর্যন্ত বাড়াতে বাধা পাওয়া শৃঙ্খলিত এক মানবীর। অন্যদিকে শ্রীমতি শাঁওলী মিত্র যজ্ঞের আগুন থেকে উদ্ভূতা দ্রৌপদীর জন্ম আর কৌরব রাজসভায় দৈবের অলৌকিকত্ব এই দুই প্রসঙ্গ ছাড়া যে দ্রৌপদীকে তুলে ধরেছেন সেই দ্রৌপদী প্রকৃতই এক সাধারণ মানবী। যার সারাজীবন কেটেছে অর্জুনকে ভালবাসা সত্ত্বেও পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রীর ভূমিকায় সর্বক্ষেত্রে সম-ভালবাসার পরীক্ষা দেয়ায়। আবার অসম্মানে বিদ্রোহী, সন্ধিবিরোধী, ধর্মযুদ্ধ-আকাঙ্ক্ষীরূপে সেই চরিত্রে অনন্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনি ক্ষাত্রনারী হিসেবে স্বামীর ক্ষত্রিয়ত্ব জাগিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টায়, ক্রোধে, প্রতিশোধপরায়ণতায় যজ্ঞের আগুনের উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই দ্রৌপদীও সাধারণেই অসাধারণ বা সামান্যতায় অসামান্য। কারণ, স্বয়ম্বরসভায় পিতা-ভ্রাতার রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হওয়া থেকে পঞ্চস্বামীর ঘর করতে বাধ্য হওয়া দ্রৌপদী সাধারণ নারীর অবয়বেই কল্পনাযোগ্য। বৈরাগ্যে ভরপুর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরজন্মে ভালবাসা লাভের প্রত্যাশা করা দ্রৌপদীর মাঝে সাধারণ মানুষের অপূর্ণ স্বপ্ন আর কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। সেই নারীর উপর নানা বিশেষণে অসামান্যতার নামে অবিচার আর অন্যায় চাপানো হয়েছে। কঠিন থেকে দুঃসাধ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ যেতে বাধ্য করে, নারীশ্রেষ্ঠা বলে কপটতার সাথে দেবীর মর্যাদা দিতে তৎপর হয়েছে। কিন্তু তার প্রকৃত অবস্থান রয়ে গেছে পদতলেই। মহাভারতে ব্যতিক্রম কিছু ক্ষেত্র ছাড়া নিজের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে চিৎকার করেনি দ্রৌপদী, কিন্তু আমাদের আলোচ্য দুই নাটকে সেই চিৎকার মৃদু থেকে ক্রমে উচ্চকিত হয়েছে। নাট্যকাররা নতুন ভাবনায় দ্রৌপদী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে, তার উপর হওয়া অসাধারণতার বিশেষণে করা অবিচার, অবরুদ্ধতা আর শৃঙ্খলতার সেই চিৎকার পৌঁছে দিয়েছেন কাল অতিক্রম করে মহাকালে।

৬. উপসংহার

নাথবতী অনাথবৎ এর নাট্যকার শাঁওলী মিত্র এবং *নিত্যপুরাণ* নাটকের নাট্যকার মাসুম রেজা তাঁদের লেখনীর আঁচড়ে মহাভারতের অসামান্যতার কৃত্রিমতা ছাড়িয়ে এক মানবী দ্রৌপদীকে এঁকেছেন। সেই দ্রৌপদী *মহাভারত*-অনুসারী হয়েও স্বয়ম্বরসভার রাজনৈতিক পুতুল হয়ে কখনো, কখনো বারবনিতা বলে চিহ্নিত করে নিজের ওপরে হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। আবার কখনও অন্যায় মেনে নিতে বাধ্য হয়ে, ভালবাসার তৃষ্ণায়,

শৃঙ্খলতায়, শৃঙ্খলতা-মুক্তির আর্তিতে ও চিৎকারে সামান্যতায় অসামান্য এক মানবী। সর্বোপরি বলা যায়, *নাথবতী অনাথবৎ* ও *নিত্যপুরাণ* নাটকের দ্রৌপদী চরিত্র মহাভারতের চরিত্র হয়েও রসানুসন্ধানে ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে ভিন্ন মাত্রার অনুধাবনের পথ উন্মুক্ত করে, যা সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বেরও মূল অভীষ্ট।

তথ্যসূত্র

কার্বে, ইরাবতী (১৯৯৮)। *যুগান্ত* (অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু.)। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

চক্রবর্তী, ননীগোপাল (২০১১)। *মহাভারত প্রসঙ্গ: চরিত্র*। কবিতীর্থ, কলকাতা।

চৌধুরী, কবীর (২০০৮)। *সাহিত্যকোষ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০০০)। *ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

দাস, সুধাময় (২০১২)। *কালের ইতিহাসে: মহাভারত*। দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

ব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (২০০৯)। *মহাভারত* (রাজশেখর বসু, অনু.)। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র (২০১০)। *মহাভারতের নারী*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, শ্রীসুখময় (১৩৭৩)। *মহাভারতের চরিতাবলী*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মিত্র, শাঁওলী (১৩৯৮)। *নাথবতী অনাথবৎ*। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

রেজা, মাসুম (২০০৪)। *নিত্যপুরাণ*। যুক্ত, ঢাকা।